সবুজ পৃথিবী
ও
মুসলিমদের অবদান

সবুজ পৃথিবী
ও
মুসলিমদের অবদান

লুকমান নাজি

অনুবাদ
আহমাদ হারুন

মাকতাবাতুল হাসান

«مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ»

আদমসন্তানের বেঁচে থাকার জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট। আর যদি তা না পারে তাহলে সে যেন এক তৃতীয়াংশ পেট পুরে খায়, এক তৃতীয়াংশ পানি পান করে এবং এক তৃতীয়াংশ বাতাসের জন্য রেখে দেয়। (*সুনানুত তিরমিযি*, ২৩৮০)

©
প্রকাশক
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯
ইসলামে পরিবেশবাদ ও টেকসইনীতি ১৩
শুরুর কথা : মাটি ও পাথর ২০
গুহা আবাসন ২৮
উঠানবাড়ি ৩১
আরবের জলাভূমি ৩৪
মধ্য এশীয় গোল তাঁবু ৪০
বেদুইন তাঁবু ৪৪
কানাত : পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ৪৮
নরিয়া : ইসলামি প্রযুক্তির জলচক্র ৫৩
ইসলামি উদ্যান ৫৯
ইসলামি প্রযুক্তির বাতাস-কল ৬৫
বাদগির : শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র ৬৯
মাশরাবিয়া : শীতাতপ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ৭৩
ইয়াখচাল : সবুজ প্রযুক্তির ফ্রিজ ৭৭
পায়রা টাওয়ার : জৈব সার কারখানা ৮০
খেজুরের বহুমুখী ব্যবহার ৮৫
স্রষ্টার উপহার বরকতময় জাইতুন গাছ ৯০
রোদে শুকানো ফল ও সবজি ৯৭
কালাবাশ : সুন্দর লাউ ১০৩
প্রথম সবুজ ক্যাম্পাস ১০৭
কুয়াশার চাষ ১১৩
বইড়া : ভাসমান উদ্যান ১১৮
একবিংশ শতাব্দীর পরিবেশবাদ ১২৩

ভূমিকা

﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

মুসা নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও ও ধৈর্যধারণ করো। বিশ্বাস রাখো, জমিন আল্লাহর। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন, আর শেষ পরিণাম মুত্তাকিদেরই অনুকূলে থাকে। (সুরা আরাফ : ১২৮)

মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে। ইসলামে এই বিস্ময়কর প্রকৃতিকে কখনোই মালিকানাহীন ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য কল্পনা করা হয়নি। ইসলাম বরং মানবজাতিকে প্রকৃতির প্রতি সহনশীল হতে উৎসাহিত করেছে। একইসঙ্গে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বব্যাপী যেসব নিদর্শন রেখে দিয়েছেন, বান্দাকে আগ্রহভরে তা নিয়ে চিন্তা করতে বলেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি একটি উন্মুক্ত গ্রন্থের মতো। এটি মানবজাতিকে আল্লাহর ক্ষমতা ও নিদর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে অনুপ্রেরণা জোগায়। পবিত্র কুরআনের এক অষ্টমাংশ জায়গাজুড়ে বলা হয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার কথা—

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ○ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾

তোমার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে এই নির্দেশ সঞ্চার করেন যে, পাহাড়ে গাছে এবং মানুষ যে মাচান তৈরি করে তাতে নিজ ঘর তৈরি করো। তারপর সবরকম ফল থেকে নিজ খাদ্য আহরণ করো। তারপর তোমার প্রতিপালক তোমার জন্য যে পথ সহজ করে দিয়েছেন, সেই পথে চলো। (এভাবে) তার পেট থেকে বিভিন্ন বর্ণের পানীয় বের হয়, যার

ভেতর মানুষের জন্য আছে শেফা। নিশ্চয় এসবের মধ্যে নিদর্শন আছে সেই সকল লোকের জন্য, যারা চিন্তাভাবনা করে। (সুরা নাহল : ৬৮,৬৯)

মানুষের অনবদ্য চিন্তাশক্তির কারণেই আল্লাহ তাকে তাঁর সৃষ্টির সেবক বা খলিফাতুল আরদ হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। আর মুসলিমদের বলা হয়েছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে বসবাস করতে।

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾

আমি আমানত পেশ করেছিলাম আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পাহাড়-পর্বতের সামনে। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল ও তাতে শঙ্কিত হলো আর তা বহন করে নিলো মানুষ। বস্তুত সে ঘোর জালেম, ঘোর অজ্ঞ।

(সুরা আহযাব : ৭২)

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۖ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। তখন ফেরেশতারা বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত আপনার গুণকীর্তন করছি এবং আপনার পবিত্র সত্তাকে স্মরণ করছি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জানো না। (সুরা বাকারা : ৩০)

বিশ্বের তাবৎ প্রাকৃতিক উৎসের ব্যবহার শর্তমুক্ত নয়। কিন্তু আশঙ্কার বিষয় হলো, আমাদের পৃথিবী এখন ভয়ংকর রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এর মূলে রয়েছে মানুষের এই দায়িত্বজ্ঞানহীন ভ্রান্ত বিশ্বাস যে, পৃথিবীর সবকিছু তারই এবং এর যাচ্ছেতাই ব্যবহার সে করতে পারে। মানুষ তার স্বেচ্ছাচারিতা থেকে প্রাকৃতিক উৎসসমূহের যথেচ্ছ ব্যবহার করেই যাচ্ছে। যার কারণে এক ধরনের ভীতিকর প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে

এসে পরিবেশের এই অপরিশোধযোগ্য ক্ষয়ক্ষতিগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, স্রষ্টাপ্রদত্ত নেয়ামতের অমর্যাদা করে মানুষ কি তাঁর নৈকট্য অর্জন করতে পারবে? আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে? তাই আমাদের বিবেককে অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে মানবজাতি হিসাবে আমরা কতটা দায়িত্বশীল ও নীতিমান!

এই ভারসাম্যহীনতা থেকে বাঁচতে হলে মানুষকে প্রথমে তার স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তাঁর প্রতি অনুগত ও কৃতজ্ঞ থেকে জীবনযাপন করতে হবে। আর তখনই আমরা স্রষ্টার উপহার আমাদের এই সবুজ পৃথিবীর যত্ন নিতে পারব, এর যে ক্ষতি করেছি তা পুষিয়ে দিতে পারব।

বিগত চৌদ্দশ বছরেরও অধিক কাল যাবৎ মুসলিমরা আল্লাহর প্রদত্ত আমানতের সম্মান করে আসছে। সুন্দর এই পৃথিবীর ধারক ও বাহক হিসাবে ইসলামি সমাজ প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ এবং টেকসই সম্পর্ক বজায় রেখে আসছে।

এই বইয়ে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফাতুল আরদ হিসাবে সবুজ ও টেকসই-প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মুসলিমদের ভূমিকাসমূহকে বিশদ আকারে তুলে ধরা হয়েছে। মুসলিমদের এসব ভূমিকা খুবই বাস্তবসম্মত এবং সহজসাধ্য। এগুলোর মধ্যে আমরা ইসলামের পরিচয় খুঁজে পাব। তা ছাড়া লক্ষণীয় যে এর সবই প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। এই প্রযুক্তিগুলো ভবিষ্যতেও পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে আমাদেরকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম।

—লুকমান নাজি
দাহরান, সৌদি আরব
মার্চ ২০১০ খ্রি.

ইসলামে পরিবেশবাদ ও টেকসইনীতি

﴿لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

(নিশ্চয়) মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশসমূহ ও জমিন সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (সুরা মুমিন : ৫৭)

আমাদের এই পৃথিবীর বায়ু, পানি ও মাটি অস্বাভাবিক গতিতে দূষিত হচ্ছে। আমরা আমাদের বনাঞ্চলসমূহ হারাচ্ছি। বাস্তুসংস্থানের এই ক্ষতি অপূরণীয়। এদিকে পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন সাতশ কোটিতে।[১] যার ফলে যে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তাতে অনেক শহরই এখন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। পত্রপত্রিকা, রেডিয়ো আর টেলিভিশনগুলোতে হরহামেশাই আমরা এসব খবর দেখতে ও শুনতে পাই। তাই প্রশ্ন জাগে—আমাদের একবিংশ শতাব্দীর জীবনযাপন কতটুকু টেকসই?

আমরা প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত হব যে, বিগত দুই শতাব্দী ধরে অতিরিক্ত ও নির্বিচার শোষণের ফলে আমাদের পরিবেশ ক্রমাগত হুমকির সম্মুখীন। অধিকাংশ ক্ষতিই এখন আর পোষানোর মতো নয়। তবুও পরিবেশগত সমস্যাসমূহ কমিয়ে আনার জন্য নানারূপ চেষ্টা চলছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বর্তমান সময়ের সক্রিয় পরিবেশবাদ আন্দোলন কেবল সাময়িক খামখেয়ালিপনা নয়, বরং জীবনের বাস্তবতা।

পরিবেশবাদীরা এখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে নাজুক এই পৃথিবীর কেউ আর নির্লিপ্ত থাকতে পারে না।

---

১. মূল বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর ১০ বছর পেরিয়েছে। ওয়ার্ল্ড মিটার ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা ৭.৮৪ বিলিয়ন তথা সাতশ ৮৪ কোটি। প্রতিবছর বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮ কোটি। ২০২৩ সালে এ জনসংখ্যা আটশ কোটিতে পৌঁছতে পারে এবং ২০৩৭ সালে নয়শ ও ২০৫৫ সালে ১০০০ কোটিতে।–সম্পাদক

বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে আমাদের পরিবেশ-সংক্রান্ত নানা সমস্যার আলোচনা দেখতে পাই। তিনি আমাদের পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন—কীভাবে মানুষ ও প্রকৃতি একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। তাঁর প্রদর্শিত পথ আধুনিক মানবসভ্যতার জন্য অনুকরণীয় জীবনব্যবস্থা। তিনি পরিমিত, দয়ার্দ্র ও সাদামাটা জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ ভবিষ্যতের সকল পরিবেশ-সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> দয়ালুদের আল্লাহ দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীর সবাইকে দয়া করো, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের দয়া করবেন।
>
> (*সুনানুত তিরমিজি*, ১৯২৪)

পরিবেশ ধ্বংস ও পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পেছনে রয়েছে ক্ষমতা ও সম্পদের প্রতি মানুষের অদমনীয় আকর্ষণ। অতিরিক্ত অপচয়ের জন্যও মানুষ দায়ী যা আমরা পশ্চিমা ভোক্তা সমাজে প্রতিভাত হতে দেখছি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অপচয়ের অনিষ্টতা থেকে সাবধান করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿يَا بَنِيٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ﴾

> হে আদমের সন্তানসন্ততিগণ, যখনই তোমরা কোনো মসজিদে আসবে, তখন নিজেদের শোভার বস্তু (অর্থাৎ শরীরের পোশাক) নিয়ে আসবে পানাহার করো, কিন্তু অপব্যয় করো না। আল্লাহ অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না। (সুরা আরাফ : ৩১)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পাঠ করেও আমরা অপচয় প্রতিরোধ করে একটি সুন্দর ও মিতব্যয়ী জীবনযাপনের শিক্ষা পেতে পারি। তিনি বলেন,

> আদমসন্তানের বেঁচে থাকার জন্য কয়েক লোকমা খাদ্যই যথেষ্ট। আর যদি তা না পারে তাহলে সে যেন এক তৃতীয়াংশ পেট পুরে খায়, এক

তৃতীয়াংশ পানি পান করে এবং এক তৃতীয়াংশ বাতাসের জন্য রেখে দেয়। (*সুনানুত তিরমিজি*, ২৩৮০)

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত সাদ রা.-কে অজুতে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে দেখে বলেন, তুমি পানি অপচয় করছ কেন? সাদ জানতে চাইলেন, অজুতেও অপচয় হয়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, প্রবহমান নদীতে অজু করলেও পানির অপচয় হয়। (*মুসনাদে আহমাদ*, ৭০৬৫)

ইসলাম ও টেকসই-মতবাদ

ইসলামি আদর্শের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে তাওহিদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ। এর মধ্যেই টেকসই-মতবাদের বিষয়টি নিহিত। পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির উৎস আল্লাহ পাক নিজেই; সৃষ্টিকুলের সবকিছু তাঁর কাছেই ফিরে যাব। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যাবতীয় সৃষ্টিজীবের প্রতিপালক। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّيْ أُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

বলে দাও, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করব? যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যিনি (সকলকে) খাদ্য দান করেন, কারও থেকে খাদ্য গ্রহণ করেন না? বলে দাও, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই এবং (আমাকে বলা হয়েছে) তুমি কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সুরা আনআম : ১৪)

টেকসইতত্ত্ব হচ্ছে, সকল প্রজাতির প্রাণিকুলকে সঙ্গে নিয়ে সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে পৃথিবীর সুষ্ঠুভাবে টিকে থাকার ক্ষমতা। কিন্তু মানবজাতির অস্তিত্ব এখন গভীর সংকটাপন্ন। এর কারণ হচ্ছে অপচয় এবং যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হয়ে পড়া। তাই টেকসইনীতি অবলম্বন করে পৃথিবীকে আমরা কীভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারি সেটা নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।

ইবনে খালদুনের টেকসইতত্ত্ব

ইসলামি ইতিহাসে প্রথম পরিবেশবাদী মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন আরব সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতের অনুসরণে তিনিও মনে করতেন, পরিবেশবাদ একটি সর্বজনীন বিষয়। মানুষ ও প্রকৃতির পরস্পর নির্ভরশীলতাই এর কেন্দ্রবিন্দু। মানবজাতি যদি পরিবেশগত সমস্যার সমাধান চায় তাহলে সবুজ বিপ্লবে বিশ্বাস করতে হবে। মানুষ যদি এই ভূপৃষ্ঠে জীবনযাপন করতে চায় তবে তাকে অবশ্যই সহজ ও বাস্তবসম্মত টেকসইনীতি ও প্রযুক্তি অবলম্বন করতে হবে। ইবনে খালদুন তার যুগের শিল্পপূর্ব সমাজকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তখনকার শহরগুলোর টেকসই অবস্থারও পর্যালোচনা করেন। ছয় শতাব্দী আগের কথা হলেও তার টেকসইতত্ত্ব নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজও প্রাসঙ্গিক।

ইবনে খালদুন তার *'মুকাদ্দিমা'*য় (ইতিহাসের ভূমিকা) শহরগুলোকে জীবসত্তা হিসাবে কল্পনা করেছেন। তার মতে, জীবসত্তার মতোই এর রয়েছে বিকাশ, উন্নয়ন এবং পতন। ইবনে খালদুনের ইতিহাসের চক্রবৃত্তি-তত্ত্ব শুরু হয়েছে একটি সৃজনশীল সময়কালে, যেখানে অভিবাসীরা নগরকেন্দ্রকে শক্তিশালী করে। এর পরেই এক ধরনের ভোক্তা সমাজ তৈরি হয়। যার ফলে শুরু হয় আত্মতৃপ্তি আর নির্বিচার ভোগবিলাস । অতঃপর যখন সামাজিক সংহতি, নাগরিকদের পারস্পরিক ঐক্য এবং শহরের সাথে নাগরিকদের যুক্তিসিদ্ধ সংলগ্নতা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই নাগরিক জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। এই অবর্ণনীয় বিপর্যয়ে নগর-সংস্কৃতি বহিরাগত আক্রমণের কবলে পড়ে যায়।

ইবনে খালদুন নগরপরিকল্পনার শর্তসমূহ সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি এসব শর্ত উপেক্ষা করার ভয়াবহতা সম্বন্ধেও আলোকপাত করেছেন। তিনি স্পষ্টতই অনুধাবন করেছিলেন যে, নগরজীবনে যখন সামাজিক সংহতি বিরাজ করবে, তখনই সভ্যতার উন্নয়ন ঘটবে।

ইবনে খালদুনের ভাষায়,

> শহরসমূহ হচ্ছে সেসব বসবাসের জায়গা যেগুলোর ব্যবহার তখনই আরম্ভ হয় একটি জাতি যখন তাদের কাঙ্ক্ষিত বিলাসিতার লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। তারা তখন নগরজীবনের সাথে মানানসই উপকরণে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে মনোযোগী হয় বসবাস উপযোগী ঘর নির্মাণে।
>
> ...নগরস্থপতিরা অনেকসময় সঠিক প্রাকৃতিক নির্বাচনে ব্যর্থ হয়। সে শুধু নিজের এবং নিজ লোকদের স্বার্থের দিকটাকেই প্রাধান্য দেয়, বাকিদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে খুব কমই চিন্তা করে। ইসলামের সূচনালগ্নে আরবরা যখন ইরাক, হেজাজ এবং ইফরিকিয়্যা শহর নির্মাণ করেছিল তখন এমনটাই চিন্তা করেছিল। তারা শুধু নিজেদের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়েই ভেবেছিল। যেমন নিজেদের জন্য চারণভূমি, গাছপালা এবং উটের জন্য ঈষৎ নোনাপানির ব্যবস্থাই ছিল তাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু তারা আবাদযোগ্য ভূমি, মানুষের জন্য সুপেয় পানি, লাকড়ি কিংবা গবাদি পশুর জন্য চারণভূমির কথা চিন্তা করেনি। ...তারা কায়রাওয়ান, কুফা, বসরার মতো শহরের গোড়াপত্তন করে।

শিবাম : মরু এলাকার ম্যানহাটন

মাটির স্থাপত্যের অসাধারণ সব নিদর্শন দেখা যায় দক্ষিণ ইয়েমেনের হাজরামাউত উপত্যকার ছোট্ট শিবাম শহরে। এ উপত্যকায় প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি দালানকোঠা মাটি থেকে অনেক উঁচু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে।

এই শহরে এরকম প্রায় পাঁচশর মতো টাওয়ার রয়েছে। এর প্রতিটি প্রায় চল্লিশ মিটার উঁচু এবং অন্তত পাঁচ থেকে দশতলাবিশিষ্ট। পৃথিবীতে মাটির দালানের মধ্যে এগুলোই সবচেয়ে উঁচু। পাঁচশ বছরের পুরানো হওয়ার কারণে এগুলো সবচেয়ে পুরাতনও বটে।

শিবামের জনসংখ্যা সাত হাজার। সরু গলিপথগুলোয় যন্ত্রচালিত গাড়ি চলাচল না করতে পারায় তারা দূষণমুক্ত রাস্তা উপভোগ করে। প্রথা অনুযায়ী একটি দালানে একটি পরিবার থাকে। নিচতলা হচ্ছে গোয়ালঘর আর দোতলা হচ্ছে গোলাঘর। এরপর ওপরে রান্নাঘর ও শোয়ারঘর। প্রতিটি দালানেই একটি করে মাফরাজ থাকে। মাফরাজ হচ্ছে আরামদায়ক ও সুপরিসর বৈঠকঘর। এটির অবস্থান থাকে সবার ওপরে।

এই আধুনিক বহুতল ভবনগুলো লোহার ফ্রেম ও কাচ দিয়ে তৈরি হলেও এগুলো কিন্তু মাটির সাহায্যেই মজবুতভাবে তৈরি। এই মজবুত অবস্থানের

বছর ধরে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে কী সুন্দর ঘরবাড়ি বানিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা আধুনিক বিদ্যাগুলো পড়ে সহজ এই দুর্দান্ত উপাদানটির ব্যবহারই ভুলে যাই। অথচ কী সহজেই-না এর মাধ্যমে অসাধারণ সব বসতবাড়ি নির্মাণ করা যায়! হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, কৃষকদের ঘরগুলো নোংরা, অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে ছিল। তাদের ঘরগুলোতে কোনো আকর্ষণীয় নকশা ছিল না। কিন্তু এটা তো মাটির ইটের দোষ নয়। একটু পরিকল্পনার ছোঁয়া লাগলেই এগুলো হয়ে উঠতে পারে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। তাই প্রকৃতিপ্রদত্ত এ জিনিস দিয়ে আমরা কেন গ্রামের ঘরবাড়ি বানাতে পারি না? কেনই-বা কৃষকদের এ ঘরগুলোকে আরও উন্নত রূপ দিতে পারি না? কৃষক ও জমিদারের ঘরবাড়িতে পার্থক্যই-বা থাকবে কেন? একটু চেষ্টা করলেই কিন্তু উভয়েরই ঘরগুলো হতে পারে সুন্দর, মজবুত ও সহজলভ্য।[৭]

৭. Fathy, Hassan. *Architecture for the Poor*. Chicago : The University of Chicago Press, 1973, 4-5.